‘শুনতে কি পাও!’

নূর জাহান

বাংলাদেশের সিনেমা আন্তর্জাতিক অঙ্গনে যারা প্রদর্শন করে সুনাম অর্জন করতে পেরেছেন তার মধ্যে অন্যতম কামার আহমেদ সাইমন। কামার নির্মিত প্রথম সিনেমা ‘শুনতে কি পাও!’ বিশ্বের বড় বড় ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে পুরস্কৃত হয়েছে। ১৫ ও ১৬ সেপ্টেম্বর ধানমন্ডির বেঙ্গল শিল্পায়নে বিশেষ প্রদর্শনী করা হয় ‘শুনতে কি পাও!’ ও ‘নীল মুকুট’ সিনেমার। বিশেষ প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করে সিনেমা দুটি নিয়ে জানাচ্ছেন সানজিদা নূর।

কামার আহমেদ সাইমন বাংলাদেশি ফিল্ম বিশ্ব মঞ্চে তুলে ধরেছেন শুধু তা কিন্তু নয় প্রশংসাও কুড়িয়েছেন। নির্মাতা কামার আহমেদ সাইমন এখন অবধি তিনটি সিনেমা নির্মাণ করেছেন। প্রথম সিনেমা ‘শুনতে কি পাও!’ ২০১২ সালের ২৯ অক্টোবরে পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন প্রামাণ্য উৎসব জার্মানির ডক-লাইপজিগের ৫৫তম আসরের ‘উদ্বোধনী ছবি’ হিসেবে প্রদর্শিত হয়। প্রায় দেড় বছর পর ২০১৪ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি সিনেমাটি বাংলাদেশে মুক্তি পায়। মাত্র এক সপ্তাহ সিনেমা হলে প্রদর্শন করা হয়। সিনেমাটি যতবার আন্তর্জাতিক অঙ্গনে পুরস্কৃত হচ্ছিল ঠিক ততবারই সিনেমা দেখার ইচ্ছে জাগছিল। কামার আহমেদ সাইমনের ‘নীল মুকুট’ সিনেমাটি দেশীয় ওটিটি প্লাটফর্ম ‘চরকি’-তে রিলিজ পাওয়ার পরপর দেখেছিলাম। এদিকে ‘অন্যদিন...’ দেশে মুক্তির অপেক্ষায়।
বাংলাদেশের সিনেমা সারা বিশ্বে সুনাম অর্জন করছে এটা আসলেই গর্বের। নির্মাতা দেশীয় দর্শকদের কথা মাথায় রেখে বিশেষ প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। শখানেক মানুষ একসঙ্গে সিনেমাটি উপভোগ করেন। ১৫ সেপ্টেম্বর ছুটির দিনের সন্ধ্যায় প্রদর্শনী শুরু হয় বেঙ্গল গ্যালারির তৃতীয় তলায়। দেড় ঘণ্টা দৈর্ঘ্যের সিনেমাটি উপভোগ করার পূর্বে নির্মাতা একটা অনুরোধ করেন কোনো ঘরানায় না ফেলে সিনেমাটিকে একটা সিনেমা হিসেবে উপভোগ করতে।

সিনেমাটি আসলে একটা অঞ্চলের একগুচ্ছ মানুষের জয়ধ্বনি। ভদ্রা নদীর পারে, সুন্দরবনের কোল ঘেঁষে ছোট্ট একটি গ্রামকে ঘিরে সিনেমার গল্প। গ্রামের নাম সুতারখালি। শতাধিক পরিবারের বসবাস এই গ্রামে। রাখী-সৌমেন দুজন ঘর বেঁধেছে এই গ্রামে। তাদের ঘরে জন্ম হয় রাহুল নামের এক সন্তানের। ২০০৯ সালের মাঝামাঝি সময়ে রাহুলের বয়স যখন মাত্র চার তখন ‘আইলা’ নামের এক ঘূর্ণিঝড় ভাসিয়ে নিয়ে যায় বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চল। সেই পরিস্থিতিতে রাখী, সৌমেন এবং রাহুলের নতুন এক জীবনের সূচনা হয়। রাখী-সৌমেনের পরিবার ঘিরে সিনেমার কাহিনী আবর্তিত হয়েছে। ঋতুর সঙ্গে সঙ্গে বদলাতে থাকে সম্পর্কের রং। নিজেদের গ্রাম রক্ষা করার জন্য কোদাল হাতে নেমে আসে সবাই। একটা প্রাকৃতিক দুর্যোগ কীভাবে সবকিছু বদলে দিতে পারে তা নিজস্ব ভঙ্গিতে পর্দায় তুলে ধরেছেন নির্মাতা। আইলা দুর্গত মানুষের বাস্তব জীবন সংগ্রামের একটি জার্নি তুলে ধরা হয়েছে সিনেমাটিতে। সিনেমাটা আট-দশটা সিনেমা থেকে ব্যতিক্রম একারণে যে প্রতিটি ডিপার্টমেন্টে সিনেমার ফিক্সড নিয়ম ভঙ্গ করেছে। বাস্তব আর সিনেমার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। বাস্তব জীবন পর্দায় উপস্থাপন করেছেন। সিনেমাটি এ জায়গায় সবার থেকে আলাদা।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ নিয়ে চলচ্চিত্র নির্মাণের সবচেয়ে চ্যালেঞ্জ হচ্ছে দৃশ্যধারণ। কেননা দুর্যোগ তো আর মানুষের ইচ্ছামতো হয় না। দুর্যোগের প্রকৃত চিত্র তুলে ধরার জন্য প্রকৃতির উপরই নির্ভর করে থাকতে হয়। সিনেমায় দুর্যোগের পর মানুষের পরবর্তী চিত্র তুলে ধরেছেন নির্মাতা। আইলা দুর্গত মানুষের নতুন করে বাঁচার সংগ্রাম দেখানো হয়েছে সিনেমাজুড়ে। নির্মাতা আইলা দুর্গত বাস্তব লোকেশন বেছে নিয়েছেন। বানানো সেট ব্যবহার করেননি। সেজন্য খুবই নিখুঁতভাবে ফুটে উঠেছে মানুষের কষ্ট। মনে হচ্ছিল চোখের সামনে ঘটছে সবকিছু। অন দ্য স্পটে ক্যাজুয়্যাল শ্যুটিং হয়েছে। কোনো কিছু বাড়তি মনে হয়নি। নির্মাতা নৈপুণ্য দেখিয়েছেন এখানেই। সবকিছু বাস্তব

রেখে নিজের গল্পটা বলতে পেরেছেন। সিনেমার প্রতিটি ডিপার্টমেন্ট নিয়ে সূক্ষ্মভাবে কাজ করেছেন নির্মাতা। সিনেমা দেখার সময় মনে হবে স্বচক্ষে আইলা দুর্গত মানুষের কষ্টগুলো দেখছি। তারপর সবগুলো দৃশ্য এক হয়ে একটা সিনেমার আকার ধারণ করলো।

সিনেমার কাস্টিং নিয়ে কথা বলতে গেলে বলতে হবে অভিনেতারা প্রথমবারের মতো ক্যামেরার সামনে এসে চমৎকার অভিনয় করেছেন। পুরো কৃতিত্ব পরিচালকের। গল্পে যে-রকম চরিত্র ডিমান্ড করে তিনি তাই রেখেছেন। অপরিচিত কিছু মানুষকে পর্দায় এনেছেন। পর্দায় তাদের উপস্থিতি দেখে মনে হবে তাদের জীবনের খণ্ড খণ্ড অংশ আমরা দেখছি। কোনো তারকা শিল্পী নেই। যারা অভিনয় করেছেন তারা প্রত্যেকেই নিজের চরিত্রটা সাবলীলভাবে তুলে ধরেছেন। বাচ্চার বোতল দিয়ে গাড়ি বানিয়ে চালানো থেকে মা-সন্তানের একসাথে মশারির মধ্যে গল্প করা কিংবা স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া সবকিছুই ছিল জীবন্ত। অভিনয়শৈলী মুগ্ধ করবে সকল শ্রেণির দর্শককে। প্রতিটি চরিত্র স্ক্রিনে জীবন্ত লেগেছে। একবারের জন্য মনে হয়নি তারা প্রথমবারের মতো লাইট, ক্যামেরা, অ্যাকশনের সামনে এসেছেন। নির্মাতা প্রতিটি চরিত্রের জন্য আলাদা প্ল্যান করেছেন নিখুঁতভাবে। ফলে প্রতিটি ঘটনা খুব রিয়ালেস্টিক ওয়েতে ফুটে ওঠে।

সিনেমার কালার গ্রেডিং খুবই সুন্দর। একদম ন্যাচারাল একটা আবহ ছিল। বাড়তি কিছু করার প্রবণতা কোথাও দেখা যায়নি। যেখানে একটা লাইট ব্যবহার করে একটা সিকুয়েন্স শুট করা সম্ভব সেখানে অযথা ফুল লাইট সেটআপ নেননি নির্মাতা। সিনেমাটির চিত্রগ্রাহকের দায়িত্ব পালন করেছেন নির্মাতা কামার আহমেদ সাইমন নিজে।

চলচ্চিত্রের সিনেমাটোগ্রাফি অদ্ভুত রকমের সুন্দর। ঢেউ যেন কথা বলে। ঢেউয়ের কলকল শব্দে সংগীতের মূর্চ্ছনা কানে বাজে। গান না থাকলেও যে গানের অনুভূতি দেওয়া যায়, ঢেউয়ের শব্দ দিয়ে পরিচালক সেই কাজটি করে দেখিয়েছেন সৈকত শেখরেশ্বর রায়কে সঙ্গে নিয়ে। একটা দৃশ্য চোখে লেগে থাকার মতো। একটা বাড়ির পাশ দিয়ে ভোর বেলা খাল দিয়ে নৌকা যাচ্ছে আর যিনি নৌকা বাইছেন তিনি গান গাইছেন; সুন্দর একটা দৃশ্য। সিনেমার প্রতিটি দৃশ্য এত সুন্দর, মনে হয় প্রতিটি সিকুয়েন্স নিজ হাতে এঁকেছেন নির্মাতা।

'শুনতে কি পাও!' একটি নৃতাত্ত্বিক (এথনোগ্রাফিক) চলচ্চিত্র। যা এক জনগোষ্ঠীর গল্প বলে। প্রামাণ্যচিত্রের জগতে এটা একটা উপধারা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বাংলাদেশের এমন ঘরানার বেশকিছু চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে। জনগোষ্ঠীদের নিয়ে সিনেমা নির্মাণ করলে সবচেয়ে বেশি লক্ষণীয় যেটি সেটি হচ্ছে নির্মাতা কতখানি জনগোষ্ঠীর মানুষের সঙ্গে মিশে গল্পটা তুলে ধরতে পেরেছেন। কামার আহমেদ সাইমন ও তার টিম এ জায়গায় শতভাগ সফল। নির্মাতার প্রতিটি ফ্রেম সুতারখালি গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর গল্প বলেছে।

মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে একপ্রকার সম্পর্ক রয়েছে। এই সম্পর্ক কখনো মানুষের জন্য দুঃখ বয়ে আনে। সবসময় মানুষের জয় হয় না।

পরিচালক কামার আহমাদ সাইমন দীর্ঘদিন কাজ করেছেন কিংবদন্তি নির্মাতা তারেক মাসুদের সাথে। নিজের নির্মিত প্রথম সিনেমাটি তাকে তিনি দেখাতে পারেননি। যা তার বিশাল বড় একটা আক্ষেপ। 'শুনতে কি পাও!' সিনেমাটি তারেক মাসুদকে উৎসর্গ করেছেন তিনি। এশিয়ার অন্যতম প্রাচীন ও মর্যাদাপূর্ণ প্রামাণ্য উৎসব জাপানের ইমায়াগাতায় 'নিউ এশিয়ান কারেন্ট' প্রতিযোগিতাসহ পঁচিশটির অধিক আন্তর্জাতিক উৎসবে আমন্ত্রিত হয়েছে ছবিটি ইতিমধ্যে।

২০১৩ এর মার্চে প্যারিসে অনুষ্ঠিত ইউরোপের অন্যতম প্রামাণ্য উৎসব সিনেমা দ্যু রিলে'র ৩৫তম আসরে ছবিটি জিতে নিয়েছে শ্রেষ্ঠ ছবির জন্য সর্বোচ্চ পুরস্কার 'গ্রাঁ প্রি'। যা ছিল বাংলাদেশের সিনেমার জন্য আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বড় অর্জন। ২০১৪ সালে এশিয়ার অন্যতম প্রধান প্রামাণ্য উৎসব 'মুম্বাই আন্তর্জাতিক উৎসব'-এ শ্রেষ্ঠ ছবির জন্য সর্বোচ্চ পুরস্কার 'স্বর্ণশঙ্খ' জিতে নেয়। ২০১৫ সালে বাংলাদেশের ৩৮তম জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারে 'শ্রেষ্ঠ প্রামাণ্য চলচ্চিত্র' হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। ২০১৬ সালে প্রদর্শিত হয় সুইজারল্যান্ডের লোকার্নো চলচ্চিত্র উৎসবের 'ওপেন ডোর্স স্ক্রিনিং' বিভাগে।